The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL.XXXVII, 2021 (pp. 59 - 70)
Published in February, 2025

কুরআন গবেষণায় শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভির কৃতিত্ব

ড. মুহাম্মদ শফিউল্লাহ কুতুবী *

প্রতিপাদ্যসার: যখন উপমহাদেশে মুঘল সাম্রাজ্যের সূর্য ক্রমেই অপসৃয়মান হচ্ছিল তখন জ্ঞান, গবেষণা ও ইজতিহাদের এক নতুন সূর্য উদিত হয়েছিল এবং তার আলোয় আলোকিত শুধু উপমহাদেশ নয় উদ্ভাসিত হয়েছিল সমগ্র মুসলিমবিশ্ব। তিনি হলেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূর্তপ্রতীক ইমাম শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি (১৭০৩-১৭৬২ খ্রি.)। সাধারণ মানুষের জন্য কুরআন বুঝা সহজ করার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। মানুষের কাছে কুরআনের প্রকৃত বাণী পৌঁছে দেওয়াকে যুগের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন বলে মনে করতেন শাহ ওয়ালিউল্লাহ। তিনি রচনা করেছেন মুকাদ্দামাহ, ফাতহুর রহমান, ফওযুল কবীল, ফাতহুল খবীর ও তাবীবুল আহাদীস এবং এই গ্রন্থগুলোতে তিনি তাফসীরের মূলনীতি বর্ণনার পাশাপাশি তাফসীরের পুরনো রীতি ও ধারায় নতুনত্ব এনেছেন। আঠারো শতকের পরে লিখিত তাফসীরগুলোতে তাঁর সংশ্লিষ্ট রচনাবলির প্রভাব সুস্পষ্ট।

ভূমিকা : আঠারো শতকের তাফসীর-বিষয়ক অধিকাংশ গ্রন্থ ও গবেষণা মূল্যায়ন করা হলে লক্ষ করা যায়, তখন কুরআন মাজীদের অর্থ, মর্ম ও বার্তা নিয়ে অধ্যয়ন এবং চর্চা কেবল ধর্মবিদ আলিমদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। সাধারণ মানুষ কেবল এর প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাস পোষণ করবে– এমন ধারণা জনপরিসরে ছিলো একেবারে সর্বজনীন ও সুপ্রতিষ্ঠিত। সাধারণ মানুষের মধ্যে কুরআন অধ্যয়ন, কুরআনের শিক্ষাগুলো অনুসন্ধান ও আত্মস্থ করার মতো বিষয় পুরোপুরি অনুপস্থিত। কুরআন বুঝা, কুরআনের ভাষ্য নিয়ে চিন্তা ও তাদাব্বুর এবং কুরআনি শিক্ষার আলোয় জীবন সাজানো যেন তাফসীরুল কুরআনের বিষয়বস্তুই নয়। অথচ কুরআনের ভাষ্য এবং এতে বিধৃত বিষয় ও প্রসঙ্গসমূহের ওপর চিন্তা বা তাদাব্বুরই এর বিষয়বস্তু হিসেবে চর্চিত হওয়া যৌক্তিক। ধর্মীয় শিক্ষাঙ্গনগুলোতে *জালালাইন* ও *কাশশাফের* মতো তাফসীরগুলো পাঠ্য ছিলো এবং সমাজের লোকেরাও কুরআন মাজীদের সঙ্গে একরকম যুক্ত ছিলো বটে কিন্তু এমন আবেগনির্ভর বন্ধন কুরআন অনুধাবন ও বাস্তব শিক্ষাকে উন্মোচন আর বিকাশ ঘটানোর পরিবর্তে শুধু জড়তা ও বন্ধ্যাত্ব তৈরির কারণ হয়েছে। ড. সউদ আলম কাসেমি আঠারো শতকের এরূপ প্রেক্ষাপটের পার্শ্বচিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে উল্লেখ করেন :

"দৃষ্টিভঙ্গির জায়গায় কুরআনুল কারিমকে ইসলামি আইন ও শরীয়তের প্রথম উৎস হিসেবে মান্য করা হতো বরাবরই কিন্তু বিধানগত গবেষণার ক্ষেত্রগুলোতে জড়তা শেকড় গেড়ে বসেছিল। তাসাউফের বয়ান, নানা কেচ্ছাকাহিনী ও গল্পের জন্য জমকালো আসর জমে উঠতো সবসময়, কিন্তু কুরআনকেন্দ্রিক আলোচনার কোনো হালাকা বা বৈঠকের আয়োজনের উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা যেতো না। মানুষের ধারণা ছিলো, কুরআন বুঝা আর সে বিষয়ে গবেষণা একান্তই আলিমদের কাজ; তাদের জন্য কুরআনের তিলাওয়াতটাই যথেষ্ট। অপরদিকে কুরআনের দারস বা পড়াশোনার অঙ্গণেও মূলভাষ্য অনুধাবনকে ছাপিয়ে তাফসীর পাঠের মনোযোগ থাকতো বেশি (কাসেমি ৫৯)।

* সহযোগী অধ্যাপক, আরবি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

এ প্রেক্ষাপটে ইমাম শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি ও তাঁর বংশীয় উত্তরাধিকারীগণ কুরআন চর্চার প্রচলিত ধারাকে পেছনে ফেলে সমাজকে এমন এক নতুনধারায় কুরআন চর্চার সঙ্গে পরিচিত করানোর প্রয়াস পান, যেখানে কুরআন বুঝা, কুরআন নিয়ে চিন্তা করা, কুরআনের বক্তব্যকে সহজীকরণের মৌলিক উপায় ও পথনির্দেশনা বিদ্যমান ছিল। শাহ ওয়ালি উল্লাহর সন্তানরাই যেন কুরআনে কারিমের অনালোচিত জগৎ ও দুর্গম উপত্যকাকে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। এর পরিপূর্ণ শিক্ষাকে সাধারণের সঙ্গে পরিচিত করিয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের নিকট কুরআন মাজীদ সম্বন্ধে যাবতীয় অপরিচিতির কালোকুয়াশার পর্দা সরে যায়। ঊনিশ শতকে কুরআনের দিকে প্রত্যাবর্তন আন্দোলনের দৃশ্যমান জাগরণ ও তাফসীর সাহিত্যের আধিক্য– যা আঠারো শতকে লিখিত তাফসীর গ্রন্থাবলির তুলনায় ছিলো অনেক বেশি। বস্তুত, এটি ছিলো শাহ ওয়ালিউল্লাহ খান্দানের কৃতিত্বের ফসল। যদিও তিনি ইসলামি জ্ঞানশাস্ত্রের সকল শাখায় বিস্তর অবদান রেখেছেন তবুও কুরআন গবেষণার বিষয়টি তাঁর বিশেষ মনোযোগ ও কাজের প্রধান ক্ষেত্র ছিলো বলা যায়। শাহ ওয়ালিউল্লাহর পিতা শাহ আবদুর রহিম (১৬৪৪- ১৭১৯ খ্রি.) ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের দাহলি অঞ্চলে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি প্রখর মেধা, ধীশক্তি ও বহুমাত্রিক প্রতিভায় ক্ষণজন্মা ব্যক্তিত্ব ছিলেন। *ফতোয়ায়ে আলমগীরীর* মতো ইসলামি আইনের বিশাল কোড সংকলনে তাঁর অবদান প্রণিধানযোগ্য। ধর্মীয় জ্ঞান ছাড়াও গণিত, জ্যামিতি ও প্রকৌশল বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন শাহ আবদুর রহিম দেহলভি। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল কোনো তাফসীর ছাড়াই কুরআনের ভাষ্য বোঝার চেষ্টা করা। তাঁর পাঠদানের বৈশিষ্ট্য ছিল, শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে কুরআনের কঠিন জায়গাগুলো সরাসরি কুরআন থেকেই বুঝিয়ে দেওয়া (জালবানি ২৭)।

কোনো তাফসীরের সহায়তা ছাড়া কুরআন অনুধাবন ও চর্চার তত্ত্বটি শাহ ওয়ালিউল্লাহর পিতা শাহ আবদুর রহিমের চিন্তার উৎসার; যে চিন্তাধারাকে শাহ ওয়ালিউল্লাহ পরবর্তী সময়ে আরও এগিয়ে নিয়েছেন। (শাহ ওয়ালি উল্লাহ, ১৮৯৭ : ১৮০) তিনি এই অভিরুচি তাঁর পিতার কাছ থেকে পেয়েছেন। শাহ আবদুর রহিমের একটি রীতি ছিল, তিনি তাঁর বন্ধুদের কোনো মজলিসে স্রেফ কুরআন তিলাওয়াত করে থেমে যেতেন না, বরং কমপক্ষে দুয়েকটি রুকু অর্থ ও ভাষ্য নিয়ে আলোচনা করতেন (সিন্ধি ৫৭)।

পৈতৃকসূত্রে কুরআনের ভাষ্য, আবেদন ও উদ্দেশ্য নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও চর্চার এই স্বতন্ত্র রীতি নিয়ে তিনি গর্ববোধ করতেন। বিভিন্ন মজলিসে এটিকে তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি সেরা অনুগ্রহ বলে আখ্যায়িত করেন। (শাহ আবদুল আজিজ, ১৩১১ হি. : ৭) এ কারণে তিনি হাদিসের পাঠ দেওয়ার আগে কুরআন কারিমের পাঠ দিতেন। (শাহ ওয়ালিউল্লাহ, ১৩০৩ হি. : ১) তিনি বরং এক জায়গায় এ-পর্যন্ত বলেছেন, বাচ্চাদের বোধ-বুদ্ধি পরিপক্কতা পৌঁছার আগ থেকেই তাদেরকে কিছু কিছু অর্থসহ কুরআন পড়ানো উচিত; যাতে তাদের চিন্তার সুষ্ঠু গঠন হাতছাড়া না হয় (শাহ ওয়ালিউল্লাহ ১)।

কুরআন গবেষণায় শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভির কৃতিত্ব

কুরআন মাজীদের জ্ঞানগত গুঢ়রহস্য, সূক্ষ্ম ইঙ্গিত প্রভৃতি বিষয়ে তিনি বেশ মনমুগ্ধকর আঙ্গিকে আলোচনা করতেন। কুরআন মাজীদের প্রতিটি বাক্য, আয়াত ধারাবাহিকভাবে বিশ্লেষণধর্মী পাঠদানে তাঁর উদ্দেশ্য থাকতো, শিক্ষার্থীরা যেন কুরআনের সামগ্রিক মর্ম, বার্তা ও আবেদন যথাযথভাবে অনুধাবনের সক্ষমতা অর্জন করে (শাহ ওয়ালিউল্লাহ, ১৩০৩ হি. : ২)। শাহ ওয়ালিউল্লাহর কুরআনসংশ্লিষ্ট অবদানগুলোর দিকে লক্ষ করলে প্রতিভাত হয় যে, কুরআনকে মানুষের মাঝে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার বিষয়ে তাঁর প্রত্যয় ছিল সুস্পষ্ট। যথা–

১. সমকালের শিরকযুক্ত রেওয়াজ ও সামাজিক কুসংস্কারের প্রভাব থেকে বাঁচার জন্য তিনি কুরআন বুঝার বিষয়টিকে সর্বজনীন করার প্রতি গুরুত্বারোপ করতেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি সামাজিক কুপ্রথা ও রেওয়াজের প্রতিকার আগেকার তাফসীরগ্রন্থে না খুঁজে সরাসরি কুরআনেই অনুসন্ধান করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন। তাঁর কুরআনের অনুবাদগ্রন্থও এই চেষ্টার অংশ।

২. তিনি আইন ও বিধানের প্রথম ও প্রধান উৎস হিসেবে কুরআনকে সামনে রাখতেন; যাতে জীবনের সকল ক্ষেত্রে খুঁটিনাটি বিষয়াদির সমাধান খোঁজার ক্ষেত্রে কুরআন মাজীদ প্রাধান্য পায়। তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে এমন উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে পরিদৃষ্ট হয়।

৩. কুরআনে কারিম নিয়ে চিন্তা-ভাবনার মধ্যে ব্যক্তিগত জীবনে তৃপ্তি ও প্রশান্তির পরিবর্তে একে সামাজিক ও সামষ্টিক লক্ষ অর্জনের মাধ্যম মনে করতেন তিনি।

৪. পৃথিবীর অন্যান্য মতবাদ ও ধর্মের ওপর ইসলামের বিজয় খেলাফতে রাশেদার আমলে অর্জন হয়েছে; এর জন্য নতুনভাবে কোনো নবি-অলির অপেক্ষায় থাকা অপ্রয়োজনীয়। দীন বিজয়ের লক্ষ্যে কুরআন মাজীদই স্বয়ং পরিপূর্ণ মানবিক জীবনব্যবস্থা উপস্থাপন করেছে। কুরআনে কারিমের মর্মকে বিশেষ শাস্ত্রে এবং তার উপযোগিতাকে শানে নুযুলের নির্দিষ্ট ঘটনায় সীমাবদ্ধ করার বৈধতা নেই; বরং এটি গোটা মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সামগ্রিক, বৈপ্লবিক ও কালোত্তীর্ণ সমাধান।

৫. তাঁর মতে, কুরআনে বর্ণিত ঘটনাবলির উদ্দেশ্য হলো, স্মরণ করিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে মানবজাতিকে শুদ্ধ ও সুন্দর জীবনধারা 'সিরাতুল মুস্তাকিমে' ফিরিয়ে আনা। কেননা, কুরআনের ভাষ্য থেকে পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, মানুষকে (তার করণীয়-বর্জনীয় ও গন্তব্য) স্মরণ করিয়ে দেওয়া কুরআন নাজিলের সাধারণ উদ্দেশ্য।

৬. কুরআনে কারিম সুবিন্যস্ত ও সুগঠিত একটি গ্রন্থ। এর বর্ণনা-ভাষ্যের ধরন, আঙ্গিক ও প্রজ্ঞাপূর্ণ মর্ম অনুধাবনের জন্য সংশ্লিষ্ট নীতিমালা আত্মস্থ করা খুবই জরুরি।

৭. শাহ ওয়ালিউল্লাহর মতে সঠিক জ্ঞান হলো যা সময়ের প্রয়োজন পূরণে সক্ষম। এই বিবেচনায় কুরআন মাজীদই একমাত্র সমকালীন গ্রন্থ যা একইসঙ্গে যে কোনো কাল ও সময়ের চাহিদা পূরণে বরাবরই সক্ষমতা রাখে। কেউ যদি নিজের সময় ও কালের সঠিক চিত্র পেতে চায় তবে বিশেষ কোনো ব্যাখ্যার আশ্রয় ব্যতিরেকে কুরআনের বাহ্যিক বর্ণনা তাকে গ্রহণ করতে হবে।

আল-কুরআন সম্পর্কিত তাঁর রচনাবলি পর্যালোচনা

শাহ ওয়ালিউল্লাহর লিখিত প্রায় শতাধিক গ্রন্থে তাঁর কুরআন মাজিদকেন্দ্রিক চিন্তাধারার প্রতিফলন লক্ষ করা গেলেও এখানে সুনির্দিষ্টভাবে কতিপয় গ্রন্থের একটি তালিকা দেওয়া হলো; যেখানে কুরআন মাজীদ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে :

১. *ফাতহুর রহমান* :

এটি সাধারণ মানুষের কুরআন বুঝার জন্য ফার্সি ভাষায় রচিত একটি সংক্ষিপ্ত তাফসীর ও অনুবাদগ্রন্থ। শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেগলভি গ্রন্থটির অনুবাদকর্ম ১৭২৮ খ্রিষ্টাব্দে শুরু করেন। এর আগে তিনি সুরা আল বাকারা ও সুরা আলে ইমরানের তরজমা সম্পন্ন করেন। ১৭৩০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি হারাইমানের জিয়ারতের মনস্থ করেন। ১৭৩৩

খ্রিস্টাব্দে জিয়ারতে হারামাইনের ব্যস্ততার কারণে তরজমায়ে কুরআনের কাজ হয় নি। ১৭৩৩ সালের পর পুনরায় শুরু করা তরজমার কাজ দশ পারা সম্পন্ন হয়। ১৭৩৭ খ্রিস্টাব্দে আবারও কাজ শুরু হলে সম্পন্ন হয় বিশ পারা। ১৭৩৮ খ্রি. ডিসেম্বর মাসে শেষ হয় শেষের দশ পারার কাজ। ১৭৪৩ খ্রিষ্টাব্দে খাজা মুহাম্মদ আমিন কাশ্মিরির প্রচেষ্টায় কুরআন মাজীদের এ অনুবাদ সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। ১৭২৮ সালে শুরু হয়ে ১৭৩৮ খ্রিষ্টাব্দে পুরো তরজুমায়ে কুরবানের কাজ সম্পন্ন হয়।

১৭৫১ খ্রিষ্টাব্দে শাহ ওয়ালিউল্লাহর নির্দেশে এ-অনুবাদের প্রথম কপির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয়। হায়দারাবাদ ওসমানিয়া ইউনিভার্সিটির ২০৪ নম্বর গ্রন্থগারে এর একটি হাতের লেখা পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। আরেকটি কপি রয়েছে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৭১৫ নম্বর গ্রন্থাগারে। আরেকটি কপি সংরক্ষিত আছে খোদাবখশ লাইব্রেরির (পাটনা, ভারত) ১১৫৭-১১৫৮ নম্বর কক্ষে। এটি দুই খণ্ডের; পৃষ্ঠাসংখ্যা যথাক্রমে ৩৮১ ও ৩৩৪। অনুলিপিকার ছফিউল্লাহ ইবন শাইখ ফকিরুল্লাহ এটি সম্পন্ন করেন ১১৮১ হিজরির ২৭ রবিউস সানিতে। দারুল উলুম দেওবন্দের লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত *ফাতহুর রহমান* এর দুটি অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি টীকাসহ সংরক্ষিত আছে।
উক্ত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি নিম্নের বিখ্যাত লাইব্রেরিগুলোতে পাওয়া যায়। যথা–

১. মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট লাইব্রেরির (টুংক), কক্ষ নং ৪২৬৪/২। কক্ষ নম্বর ৪২৬৪/১৮২-১-৩ (*হাশিয়ায়ে তরজমায়ে ফাতহুর রহমান* নামে এবং টীকা সম্বলিত)
২. মাওলানা আবুল কালাম আজাদ লাইব্রেরি (আলীগড়) কক্ষ নম্বর- ১/৬৫ এ।
৩. জামিয়া মিল্লিয়ায় (দিল্লি) কক্ষ নম্বর যথাক্রমে (৭১১৪)-১১৮ ও (১৪০৩) ০০৩৮।
৪. দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা লক্ষ্ণৌসহ আরও চৌদ্দটি লাইব্রেরিতে এর পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় (শাহ ওয়ালিউল্লাহ ১৫)।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ কুরআন মাজীদের আলোচ্য অনুবাদে সারগর্ভ, সংক্ষিপ্ত একটি ভূমিকা সংযোজন করেন। তিনি তরজমার উদ্দেশ্য ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য সাবলীলভাবে তুলে ধরেন। পাঠকের জন্য তাঁর মুখবন্ধটি নির্দেশকের ভূমিকা পালন করবে। ভূমিকাটি বিভিন্ন বিন্যাসে প্রকাশিত একাধিক সংস্করণে সংযোজিত হয়েছে। তবে গ্রন্থটির সবচেয়ে উন্নত ও নির্ভরযোগ্য সংস্করণ হলো খানাকায়ে রায়পুরের মসনদনশীন মুফতি আবদুল খালেক আজাদ কৃত সংস্করণ। মুফতি আবদুল খালেক আজাদ (জ. ১৯৭২ খ্রি.) শায়খুল হাদিস ওয়াত্ তাফসীর, ইদারায়ে রহিমিয়া উলুমে কুরআনিয়া, লাহোর, পাকিস্তান। ফার্সি ভাষায় কুরআন মাজীদের অন্যান্য তরজমা থাকা সত্ত্বেও শাহ ওয়ালিউল্লাহর তরজমার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি লিখেন :

"আজকের স্থান-কাল বিবেচনায় মুসলমানদের সর্বজনীন কল্যাণচিন্তার দাবি হলো, সরল ও প্রচলিত ফার্সি ভাষারীতিতে সাধারণের জন্য কুরআন মাজীদের অনুবাদ করা। যে অনুবাদের ভাষা হবে বাহুল্যবর্জিত, নির্মেদ ও ব্যাখ্যামুক্ত। যেখানে থাকবে না কোনো টীকা ও বিশ্লেষণ। যাতে সাধারণ-বিশেষ সকলেই এটি সমানভাবে বুঝতে পারে" (শাহ ওয়ালিউল্লাহ ১)।

শাহ ওয়ালিউল্লাহর ভূমিকার এরূপ ভাষ্য থেকে স্পষ্ট হয়, তাঁর সমকালে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকে কুরআন মাজীদ অধ্যয়ন সর্বসাধারণের মাঝে ব্যাপকতা লাভ করে নি। লোকেরা রুমি, সাদী ও জামির কবিতার আসর জমাতো কিন্তু কুরআনের মজলিসে মানুষের সমাগম হতো না। তরজমায়ে কুরআন ছিল প্রকৃতপক্ষে তৃণমূল মানুষের কাছে কুরআনচর্চার চেতনাকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়াস। পরিতাপের বিষয় হলো, কতিপয় সমালোচক শাহ

ওয়ালিউল্লাহর ওপর অপবাদ দেন যে, 'তিনি স্রেফ নিজের সাহিত্যরুচির তৃপ্তির জন্য কুরআন মাজীদের স্বতন্ত্র অনুবাদ করেছিলেন।' এ-প্রসঙ্গে সাইয়েদ আতহার আব্বাস রিজভী বলেন :

``The new translation being started by Shah Wali Allah to satisfy his own literary and spiritual tastes. He did not give high priority to its production'' (Rizwi 231).

অথচ এমন অভিযোগ সর্বৈব ভিত্তিহীন। শাহ ওয়ালিউল্লাহ তরজমায়ে কুরআনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতকারীদেরকে অনুলিপি তৈরির ক্ষেত্রে এই মর্মে সুস্পষ্টভাবে নিয়ম-কানুন বেঁধে দেন যে, কোন্ কোন্ বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবে। কুরআনের অনুবাদ বিষয়ে নিজের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি এভাবে উল্লেখ করেন :

১. এ অনুবাদ বিশেষভাবে কৃষক-শ্রমিক অর্থাৎ প্রান্তিক স্তরের মানুষের জন্য তৈরি করা হয়েছে। এছাড়াও যারা নানান ব্যস্ততার কারণে তেমন সময় বের করতে পারেন না এবং জীবনের শেষ সময়ে এসে কুরআনের দিকে মনোযোগী হয়েছে তারাও এ থেকে উপকৃত হতে পারবে। শিশু-কিশোরদের কিছুটা বোধ গড়ে ওঠার সঙ্গেসঙ্গে এ অনুবাদ পড়তে দেওয়া উচিত। যাতে তারা চারপাশের নেতিবাচক পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত না হয় এবং স্বভাবগত ইসলামি নৈতিকতায় গড়ে ওঠে।
২. এ অনুবাদের আরেকটি উদ্দেশ্য হলো, (অনারব ভাষাভাষী) সাধারণ মানুষ যারা আরবি ব্যাকরণ বুঝতে সক্ষম নয়, তাদের জন্য কুরআন মাজীদের মোটামুটি প্রাথমিক পর্যায়ের অনুবাদ পড়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া। সাধারণ মানুষ যেহেতু দীর্ঘ ও বিস্তারিত তাফসীর অধ্যয়ন করার যোগ্যতা রাখে না; কাজেই তাদের অধ্যয়ন তরজুমায়ে কুরআন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।
৩. এ তরজমায় পরিচিত বাক্য, সহজ শব্দ, সরল বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে। যাতে সাধারণ মানুষ কুরআনের শিক্ষাকে সমকালীন অবস্থার প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সমন্বয় করে দীনি ও কুরআনি চেতনায় সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারে।
৪. প্রাচীন তাফসীরগুলোতে হয়তো শাব্দিক অনুবাদ অথবা ভাবানুবাদের রীতি অনুসৃত হয়েছে। উভয় প্রকারের কিছু ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এখানে দুটির সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। বিশ্লেষণধর্মী শব্দ ব্যবহার করার ফলে এ তরজমা স্রেফ অনুবাদ নয় বরং ভাবপ্রসারী তরজমায় পরিণত হয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, তরজমা নয় যেন তরজমানি (শাহ ওয়ালিউল্লাহ ২৯১)।

এ তরজমার কতিপয় বৈশিষ্ট্য

ফাতহুর রহমান গ্রন্থে শাহ ওয়ালিউল্লাহ এ তরজমার সঙ্গে সংক্ষিপ্ত টীকা সংযোজন করেছেন; যা কুরআন বুঝার ক্ষেত্রে বেশ সহায়ক। এসব টীকায় তিনি শানে নুযুল, আয়াতের পূর্বাপর ধারাবাহিকতা, নাসেখ-মানসূখ (রহিত বা রহিতকারী) আয়াত, ফিকহিবিধান, উপমা, প্রাসঙ্গিক ঘটনা বিষয়ে আলোকপাত করেন। এই টীকার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো, অল্পকথায় মর্মের ব্যাপকতা। যেমন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ

এ-আয়াতের অনুবাদ করেছেন, "হে নবি, আপনি কাফির ও মুনাফিকদের সঙ্গে লড়াই করুন" (সুরা তাওবা : ৩)। আয়াতের টীকায় মাত্র দু'টি শব্দ লিখেছেন, তরবারি ও মুখে। কাফিরদের সঙ্গে জিহাদ হবে তরবারি দিয়ে আর মুনাফিকদের সঙ্গে জবানের মাধ্যমে। মাত্র দু'টি শব্দে বিস্তারিত বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারা মামুলি ব্যাপার নয়। শাহ ওয়ালিউল্লাহর অনুসারীগণ এ ধাঁচের টীকা প্রসঙ্গে ভূয়সী প্রশংসা করেন (শাহ ওয়ালিউল্লাহ ৪)।

১. শাহ ওয়ালিউল্লাহ আল কুরআনের অনুবাদের একাধিক জায়গায় পূর্বসূরীদের সাথে ভিন্নমত পোষণ এবং নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখ করেছেন। যেমন, أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ (সিদ্ধি, ২০০২ : ৫৮-৬০) এর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অধিকাংশ মুফাসসিরের মত হলো জান্নাত হবে সৎ লোকদের জন্য কিন্তু তিনি এখানে الْأَرْضَ (ভূমি) শব্দের প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য বলে অভিমত ব্যক্ত করেন এবং সৎ লোক থেকে উদ্দেশ্য উম্মতে মুহাম্মদী বলে সাব্যস্ত করেন। কাজেই তিনি বলেন, শেষ জামানায় একজন আল্লাহর নবি প্রেরিত হবেন এবং তাঁর উম্মত প্রত্যেক ভূখণ্ডে বিজয়ী হবে। অনুরূপভাবে وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ আয়াতে সকল মুফাসসিরের মত হলো, এখানে حُبِّهِ -এর সর্বনামের উদ্দিষ্ট নামপদ হলো আল্লাহ, কিন্তু শাহ ওয়ালিউল্লাহর মতে তা নয়, বরং নাম পদ الْمَالَ (সুরা আম্বিয়া : ১০৫)।

তাঁর মতে আয়াতের অর্থ- যারা সম্পদের মায়া থাকা সত্ত্বেও সম্পদ ব্যয় করে।

২. *ফাতহুর রহমান* গ্রন্থে শাহ ওয়ালিউল্লাহ এতটুকু অবকাশ বা ব্যাপকতা রেখেছেন যে, কোনো আয়াতের যদি একাধিক অর্থের সম্ভাবনা থাকে; তিনি সে ক্ষেত্রে সবগুলো অর্থ বর্ণনা করে দিয়েছেন। এর দ্বারা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, আয়াতের তরজমায় উভয় অর্থ করা যেতে পারে। যেমন-

الْحَاقَّةُ - مَا الْحَاقَّةُ

এর অনুবাদে লিখেছেন, কিয়ামত কী ? (সুরা হাক্বাহ : ১-২) আরেক অর্থ করেছেন, পরিণাম অবধারিত (শাহ ওয়ালি উল্লাহ, তা. বি.: ৩৭)। তিনি কতিপয় আয়াতের এমন অনুবাদ করেছেন, যা ইতোপূর্বে অন্য কারও তরজমার সঙ্গে মিলে না। যেমন- وَفَارَ التَّنُّورُ এর ক্ষেত্রে লক্ষণীয় (সুরা বাকারা : ১৭৭)। সাধারণ মুফাসসিরগণ এর উদ্দেশ্য বলেন, ভূগর্ভ থেকে পানি বের হওয়া কিন্তু শাহ ওয়ালিউল্লাহর মতে এর রূপক অর্থ আল্লাহর গজব ও শাস্তি (শাহ ওয়ালিউল্লাহ ৪৮০)।

৩. আয়াতের বক্তব্যে দৃশ্যত দ্বন্দ্ব নিরসনে তিনি সমন্বয়ের নীতি অবলম্বন করেছেন। যথা- মক্কী সুরাগুলোতে বলা হয়েছে, ইহুদিরা কুরআনের সত্যায়ন করে অন্যদিকে মাদানি সুরায় বলা হয়েছে তা অস্বীকার করে। শাহ ওয়ালিউল্লাহ এ আয়াতে সমন্বয় এভাবে করেছেন যে, সে সময়ে যেহেতু ইহুদিদের কাছে দাওয়াত পৌঁছে নি; কাজেই তারা অস্বীকারও করে নি কিন্তু মদিনায় যখন তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে; তখন তারা জেদ ও হঠকারিতাবশত কুরআনকে অস্বীকার করে বসে (শাহ ওয়ালিউল্লাহ ৪৮০)।

৪. *ফাতহুর রহমান* গ্রন্থের কিছু দুর্বলতাও আছে। যেমন ইসরাইলি (ইহুদিদের সূত্র) বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে তিনি যে নীতি প্রণয়ন করেন তা পুরোপুরি অগ্রহণযোগ্য কিন্তু هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا আয়াতের ক্ষেত্রে তিনি উক্ত নীতি থেকে বেরিয়ে এসেছেন। অনুরূপ মুসা আ. ও খিজিরের ঘটনায় তিনি 'গোলাম' শব্দের অর্থ লিখেছেন : নওজোয়ান; (সুরা হুদ : ৪০) যা আয়াতের আঙ্গিক ও ইঙ্গিতের সঙ্গে মিলে না। কারণ নওজোয়ান বুঝানোর জন্য আয়াতে فتية শব্দ রয়েছে।

ফাতহুর রহমান গ্রন্থের পর্যালোচনার জন্য বিস্তারিত বিশ্লেষণের দাবি রাখে। এ বিষয়ে বিস্তর গবেষণা হয়েছে এবং আরও বহুকিছু বিশ্লেষণের সুযোগ আছে। সবকিছুর পরও বলা যায়, *ফাতহুর রহমান* শাহ ওয়ালিউল্লাহ শিক্ষাধারার অন্যতম বুদ্ধিবৃত্তিক বুনিয়াদ। তরজমায়ে কুরআনের সূচিত এ পথ ধরে *মুয়াদ্দিহুল কুরআন* ও *ফাতহুল আজিজ* এর মতো অসাধারণ রচনাকর্ম অস্তিত্ব লাভ করেছে, যা সাধারণ মানুষের জন্য কুরআন বুঝার অধিকতর সহজ ও নতুন

দিগন্ত উন্মোচন করেছে। কাজেই, আঠারো শতকের কুরআন গবেষণার এই ধারা পরবর্তীকালে তরজমা ও তাফসীরের গবেষণাকর্মে গভীর প্রভাব ফেলেছে এমন দাবি মোটেও অত্যুক্তি হবে না। এছাড়াও তাঁর এ-মননশীল কর্ম সংযোজন করেছে নতুন জ্ঞান-গবেষণার কতিপয় নতুন মাত্রা।

২. *আল মুকাদ্দিমা ফি কাওয়ানিনিত্ তরজমা*

কুরআনুল কারিমের তরজমার ক্ষেত্রে শাহ ওয়ালিউল্লাহ কতিপয় নীতিমালা প্রণয়ন করেন, যা তিনি *আল মুকাদ্দিমা ফি কাওয়ানিত্ তরজমা* শিরোনামে গ্রন্থিত করেন। এটি তাঁর *ফাতহুর রহমান*- গ্রন্থের শুরুতে সংযোজিত ভূমিকা থেকে আলাদা। এটি বহু বছর যাবত আলোকবর্তিকা হিসেবে গবেষকদের পথ দেখাচ্ছে। মাওলানা হিফজুর রহমান সিওহারভির (মৃ. ১৯৬২ খ্রি.) গ্রন্থটি নিয়ে প্রথমবারের মতো আলোচনার সূত্রপাত করেন। তিনি গ্রন্থটির ফার্সি পাণ্ডুলিপির আলোকে উর্দু অনুবাদসহ দিল্লি থেকে প্রকাশিত *মাসিক বুরহান*-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেন। তাঁর ব্যবহৃত পাণ্ডুলিপি টুংকের এরাবিক এন্ড প্রেশন ইনস্টিটিউট এর লাইব্রেরি ২/২১৬ নম্বর কক্ষে সংরক্ষিত আছে। এ-পাণ্ডুলিপির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, সাইয়েদ আহমদ শহীদের ভাগিনা সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী হোসাইনি সুকতির হাতে অনুলিখন। এটি ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে প্রস্তুত করা হয়; তা সত্ত্বেও অনুলিখনে বেশ কিছু লিপিগত ভুল চোখে পড়ে। বরকতের জন্য মাওলানা সিওহারভি এই পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করলেও অন্যান্য কপির সঙ্গে মিলিয়ে (ক্রসচেক) যাছাই-পদ্ধতি অনুসরণ করে তা প্রকাশ করা সমীচিন ছিলো (শাহ ওয়ালিউল্লাহ ৩২৯) তবে তিনি এই সময়-সুযোগ পান নি। মাওলানা আবদুর রশিদ লাহোরীর মতে, মাওলানা সিওহারভি দ্রুততম সময়েই কাজটি সম্পন্ন করেন তবে তিনি নিজে অন্যান্য পাণ্ডুলিপির সঙ্গে মিলিয়ে এটা সংশোধন ও পরিমার্জনের দাবি করলেও শেষ পর্যন্ত সম্পাদিত সেই পাণ্ডুলিপি প্রকাশিত হয় নি (শাহ ওয়ালিউল্লাহ ২০৯)।

আল মুকাদ্দিমা ফি কাওয়ানীনিত্ তরজমা গ্রন্থের গবেষণা-সংস্করণটি প্রস্তুত করার সৌভাগ্য হয় মুফতি আবদুল খালেক আজাদের (খানকায়ে রায়পুরের মসনদনশীন)। তিনি চারটি হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি সামনে রেখে এটার পরিমার্জন করেছেন এবং অত্যন্ত ভালো মানের উর্দু তরজমা করেছেন (শাহ ওয়ালিউল্লাহ ৪৩৮)। তিনি এ-পাণ্ডুলিপিগুলো সামনে রেখে কাজ করেছেন :

১. টুংকের পাণ্ডুলিপি, ১৮১২ খি., অনুলিখন : সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী;
২. নদওয়াতুল ওলামার পাণ্ডুলিপি, অনুলিখিন : সাইয়েদ ইবরাহিম নসিরাবাদী;
৩. নদওয়াতুল ওলামা কপি, তারিখ ও অনুলিপিকার অজ্ঞাত;
৪. পাণ্ডুলিপি, ওরিয়েন্টাল ন্যাশনাল কলেজ, লাহোর, অনুলিখন : মাওলানা সাইয়েদ নুরুল হক আলাভি তবে তার ইন্তেকালের পর এটি হারিয়ে যায়। মুফতি আবদুল খালেক আজাদের এই কৃতিত্বপূর্ণ কাজ পরবর্তী সময়ের জন্য অনুসরণীয় গবেষণা (সিওহারভি ২৩৫)

আল মুকাদ্দিমা ফি কাওয়ানীনিত্ তরজমার আরও কিছু পাণ্ডুলিপি:

১. জামিয়া মিল্লিয়া (দিল্লি) পাণ্ডুলিপি, লাইব্রেরি কক্ষ নম্বর-০০২২ (৭৫২০০)।
২. খোদাবখশ লাইব্রেরি (পাটনা) পাণ্ডুলিপি, পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৬।
৩. দারুল উলুম দেওবন্দ-এর দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপি, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬।
৪. পাণ্ডুলিপি, কুতুবখানা আসিফিয়া, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬।

৫. মাওলানা সিওহারভি কাজ করেছেন এমন আরও তিনটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। যার মধ্যে প্রথমটি কপি তৈরি হয়েছে ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে। এর অনুলিখন করেছেন হাফিজ মুহাম্মদ আমিন, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬। হাতে লেখা আরেকটি পাণ্ডুলিপি রয়েছে লাইব্রেরি নম্বর-২/১৫৪৭ এ। দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠাসংখ্যা ৮, লাইব্রেরি নম্বর-৬/১৯৮৮। তৃতীয় পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠাসংখ্যা মাত্র ৩; লাইব্রেরি নম্বর-১৪২৬৪।

৬. আরেকটি পাণ্ডুলিপি রয়েছে পেশোয়ার ইউনিভার্সিটিতে, যা *ফাতহুর রহমান*-এ সংযুক্ত। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬।

আল মুকাদ্দিমা ফি ফাতহির রহমান এর প্রকাশিত চারটি সংস্করণ সম্বন্ধে প্রাপ্ত তথ্যগুলো সংক্ষেপে এরূপ :

- *ফাতহুর রহমান*, মাকতাবা বাশি (মিরাট) ১৮৬৮ খ্রি./১২৮০ হি.
- *ফাতহুর রহমান*, প্রকাশক : আসাহহুল মাতাবি, (করাচি) তা.বি.
- *ফাতহুর রহমান*, প্রকাশক : আকাদেমি দাওয়াতে দানিশগাহ বাইনাল মিল্লিয়িল ইসলামী (ইসলামাবাদ), ২০০১-খ্রি. ১৪২২ হি.
- *ফাতহুর রহমান*, তাজ কোম্পানি লি. (লাহোর), তা.বি.

এর প্রথম মূল টেক্সট অনুবাদ করেন মাওলানা হিফজুর রহমান সিওহারভি, যা *মাসিক বোরহান* (দিল্লি), অক্টোবর, নভেম্বর ১৯৪৫ খ্রি. সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। মূল টেক্সটসহ দ্বিতীয় অনুবাদটি করেন মাওলানা মুহাম্মদ মুশতাক তাজাওয়ারি। এটি 'ইসলাম আওর আসরে জাদীদ' সাময়িকী জুলাই-অক্টোবর ২০১০ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তৃতীয় অনুবাদ করেন মুফতি আবদুল খালেক আজাদ। এটি পূর্বের দুটি অনুবাদকর্মের চেয়ে উন্নত মানের। সিন্ধি ভাষায় অনুবাদ করেন মাওলানা গোলাম মোস্তফা কাসেমি। এটি সিন্ধি ভাষার '*আর রহিম* '(হায়দারাবাদ), অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৬৫-এ প্রকাশিত হয়। মাওলানা সউদ আলম কাসেমির মতে, *আল মুকাদ্দিমার* প্রকাশকাল ১১৫০-১১৫১ হিজরির মাঝামাঝি (আবদুর রশিদ ১৩৬)। তবে মুফতি আবদুল খালেক আজাদ একটি স্বতন্ত্র মত উপস্থাপন করেছেন। তিনি লিখেন :

" গ্রন্থটি সংকলনের ব্যাপারে উক্ত সালটিকে নির্ধারণ করা ঠিক হবে না। কারণ, *মুকাদ্দিমাতু ফাতহির রহমান বি তরজমাতিল কুরআন* এর হাতে লেখা একটি পাণ্ডুলিপি আমার কাছেও রয়েছে। এর টীকায় শাহ ওয়ালিউল্লাহর লেখা একটি নোট দেখা যায়, যাতে তিনি কুরআনের তরজমা শুরু করার সন ১৭২৮ খ্রি./১১৪১ হি. উল্লেখ করেন। এর দ্বারা বোঝা যায়, গ্রন্থটি ওই বছরই লেখা হয়। তা সত্ত্বেও শাহ ওয়ালিউল্লাহর একটি কথা মাওলানা কাসেমী নিজের মতের পক্ষে দলিল হিসেবে উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, 'এটি কুরআনের তরজমাসংক্রান্ত নীতিমালা বিষয়ক পুস্তিকা. যার নাম দেওয়া হয়েছে- *আল মুকাদ্দিমা ফি কাওয়ানিনিত্ তরজমা*। কুরআন মাজীদের তরজমার পাণ্ডুলিপি তৈরির একই সময়ে তা প্রণয়ন করা হয় (আবদুর রশিদ ১৩৬)।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ তাঁর সমসাময়িক তরজমা ও তাফসীরের তিনটি ধারা নিয়ে গবেষণার পর নিজে চতুর্থ ধারার সূচনা করেন। তিনি এই রচনাকর্মে আরবি-ফার্সির নানাবিধ ভাষা-কাঠামোর জটিলতাকে চিহ্নিত করে অনুবাদকের জন্য তার সমাধানের পথ বাতলে দিয়েছেন। তরজমায়ে কুরআনের বুনিয়াদি মূলনীতি এভাবে প্রণয়ন করেছেন যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অনুবাদকরা সকল প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করতে পারেন। মুফতি আবদুল খালেক আজাদ এ বিষয়টিকে অধিকতর স্পষ্ট করার জন্য এর বিশ্লেষণে উল্লেখ করেন :

'*আল মুকাদ্দিমা ফি কাওয়ানিনিত্ তরজমা* গ্রন্থে শাহ ওয়ালিউল্লাহ তরজমায়ে কুরআনের বিষয়ে মৌলিক দিকগুলোর ওপর আলোকপাত করেছেন। তিনি সামগ্রিকভাবে বিষয়টিতে গবেষণা করেছেন। ফলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কোনো

দিক তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। তিনি সূত্রও নির্ধারণ করেছেন সামগ্রিকভাবে। তবে এসব সূত্রের সবিস্তার বিশ্লেষণ পেশ করেছেন তাঁর সন্তান ও শাহ ওয়ালিউল্লাহর পরবর্তীকালে বংশধর আলিমগণ। শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভির চিন্তাধারায় প্রভাবিত আলিমদের কৃত তরজমায় তাঁরই সূত্রের বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

৩. *আল ফওযুল কবীর ফি উসুলিত্ তাফসীর* :

এটি ফার্সি ভাষায় রচিত উসুলুত তাফসীর বিষয়ে এমন গ্রন্থ যা নিয়ে উপমহাদেশের আলিমদের যে কোনো মাত্রার অহঙ্কার এই অবদানের তুলনায় সামান্যই হবে। এতে তিনি বিগত এক হাজার বছরের উলুমে কুরআনের সারনির্যাস একত্র করে দিয়েছেন।

যেমন-

১। উলুমু তাবিলি কাসাসিল আম্বিয়া
২। উলুমে খামছায়ে কুরআনিয়া
৩। উলুমে তরজমায়ে কুরআনে কারিম
৪। উলুমু খাওয়াছছিল কুরআন
৫। উলুমে হরুফে মুকাত্তাআত

মুফতি আবদুল খালেদ আজাদ উল্লেখ করেন : এই পাঁচটি বিষয়ের জ্ঞান কুরআন মাজীদের প্রায় সবগুলো দিককে শামিল করেছে। সমাজ গঠনের মৌলিক যাবতীয় উপাদানকে তিনি এই পঞ্চসূত্রে গেঁথে দিয়েছেন।

আল ফওজুল কবীর প্রকৃতপক্ষে শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভির কুরআন গবেষণা বিষয়ে মৌলিক ও বুনিয়াদি গ্রন্থ। এই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে তিনি কুরআন অধ্যয়নের সূত্রাবলির সারনির্যাস উপস্থাপন করেছেন। কুরআন মাজীদ যেহেতু শাহ ওয়ালি উল্লাহর চিন্তা ও গবেষণার মূল কেন্দ্র সেহেতু, কুরআন অধ্যয়নে আগ্রহীদের বড় বড় একাধিক তাফসীর গ্রন্থ অধ্যয়নের পরও যা অর্জন করতে সক্ষম হবে না; এই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে তিনি তার চেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও সূত্র সন্নিবেশ করেছেন। যদিও ইতোপূর্বে উলুমে কুরআন বিষয়ে যারকাশি ও সুয়ূতীর গবেষণাকর্ম বিদ্যমান ছিলো কিন্তু উপমহাদেশে ইতোপূর্বে অন্য কেউ এ বিষয়ে এমন সমৃদ্ধ গবেষণাকর্ম সম্পাদন করেন নি। শাহ ওয়ালি উল্লাহ এ গ্রন্থ রচনার প্রয়োজনীয়তা ও কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, "যখন আমার জন্য কুরআন অনুধাবনের দ্বার উন্মুক্ত হলো, আমি মনস্থ করলাম, কুরআন পিপাসু বন্ধুদের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তক রচনা করবো; যাতে কুরআন বোঝার প্রয়োজনীয় সূত্র একত্রে লিপিবদ্ধ থাকবে। আল্লাহর রহমতে কুরআন পাঠকদের জন্য এই সূত্রগুলো আত্মস্থ করার পর কুরআন বুঝার ক্ষেত্রে সুপ্রশস্ত পথ উন্মুক্ত হবে।

আল ফওজুল কবীর এর একাধিক পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। নিম্নে কিছু পাণ্ডুলিপির বর্ণনা প্রদত্ত হলো :

• রামপুরের রেজা লাইব্রেরির ৬৬ নম্বর কক্ষে একটি পাণ্ডুলিপি রয়েছে এর অনুলিপিকার হুজুরুল্লাহ কাশ্মিরী এবং অনুলিখন সাল ১৭৬৬ খ্রি.। তাহলে বোঝা যাচ্ছে শাহ ওয়ালিউল্লাহর মৃত্যুর দুই বছর পর এটি প্রস্তুত হয়। এ বিবেচনায় এটি *ফওজুল কবীরের* প্রাচীন পাণ্ডুলিপি।

• দারুল উলুম দেওবন্দের লাইব্রেরিতে একটি অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। যেখানে অনুলিপিকারের নাম লেখা নেই। তবে মাওলানা নুর হোসাইন রাশেদ কান্দলভির মতে এটি শাহ মুহাম্মদ আশেক ও আবদুর রহমান পাহলভি এ দুজনের হস্তলিপির সঙ্গে মিলিয়ে দেখার পর দৃঢ় ধারণা হয়েছে এটি তাদের যে কোনো একজনের কৃত অনুলিপি। আরও যেসব লাইব্রেরিতে ফওজুল কবীরের পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় :

• খোদাবখশ লাইব্রেরিতে দুটি পাণ্ডুলিপি রয়েছে।

• জামিয়া ওসমানিয়া হায়দারাবাদ।

• মাওলানা আজাদ এরাবিক প্রেশন রিসার্চ ইনস্টিটিউট (টুংক) লাইব্রেরি।

• জামিয়া মিল্লিয়া, দিল্লিতে একটি পাণ্ডুলিপি আছে।

• হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লি। এতে অনুলিখনের সন ১৮৬৬ খ্রি. লিপিবদ্ধ আছে।

• হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয়, করাচি।

• ইসলামিয়া ইউনিভার্সিটি কলেজ, পেশোয়ার।

৪. ফাতহুল খবীর :

এটি কুরআন মাজীদের غريب শব্দগুলোর ব্যাখ্যা ও শানে নুযুল সম্বন্ধে শাহ ওয়ালিউল্লাহর আরবি ভাষায় লিখিত একটি অনবদ্য রচনা। এটিকে *আল ফওজুল কবীরের* পরিশিষ্টও বলা যায়। যদিও লেখক *আল ফওজুল কবীর*-এর ভূমিকায় এটাকে এ গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায় বলে উল্লেখ করেছেন (কাসেমি ৪০)। তবে এরপরও বইটির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। লেখক এ পুস্তিকায় কুরআন মাজীদের ১১২ টি সুরার প্রায় দুই হাজার غريب শব্দের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সন্নিবেশ করেছেন। তবে কেবল সুরা কদর ও সুরায়ে কাফিরুনের আলোচনা এই পুস্তিকায় নেই। সুরায়ে কাফিরুনে লেখকের দৃষ্টিতে গরিব (ব্যাখ্যাসাপেক্ষ) কোনো শব্দ নেই। সুরা কদরে অবশ্য ব্যাখ্যাসাপেক্ষ শব্দাবলি আছে। পুরো সুরাকে তিনি বাদ দিলেন কেন তা বোধগম্য নয়। তিনি এতে অনেক সুরা ও আয়াতের শানেনুযুল বর্ণনা করেছেন। তা সত্ত্বেও একটি ব্যাপার সবিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, শাহ ওয়ালিউল্লাহ বিশেষ অর্থ ও নির্দিষ্ট কারণের পরিবর্তে সাধারণ অর্থ গ্রহণের রীতি অবলম্বন করেন। তাঁর মতে, আয়াত নাযিলের একটি নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট থাকতেই পারে তবে বিধানের ক্ষেত্রে তা বিবেচ্য হবে না বরং সেটা স্থায়ী ও ব্যাপক হবে। এছাড়াও শাহ ওয়ালিউল্লাহর মতে 'গরিব' শব্দের অর্থ বিরল বা ভাষাভাষীদের মাঝে কম প্রচলিত শব্দ উদ্দেশ্য নয়; বরং তিনি এ পরিভাষা দ্বারা সমার্থবোধক, দ্ব্যর্থবোধক, কঠিন ও ইঙ্গিতবাচক শব্দ বুঝিয়ে থাকেন। এ-কারণে *ফাওজুল কবীর*- এ এমন অনেক শব্দ পাওয়া যায় যা আরবদের কাছে বিরল ও অপরিচিত নয়।

ফাতহুল খবীর- এর মুদ্রিত কপি ও পাণ্ডুলিপি সহজলভ্য হলেও এর হাতে লেখা কয়েকটি বিশেষ পাণ্ডুলিপি আলাদাভাবে সংরক্ষিত আছে :

• মাওলানা আবুল কালাম আজাদ এরাবিক প্রেশন রিসার্চ ইনস্টিটিউট (টুংক), লাইব্রেরি কক্ষ নং-১৯৯৯।

• জামিয়া উসমানি হায়দারাবাদ, অনুলিখন সাল- ১৮৩৮ খ্রি./১৪৫৪ হি.।

• ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি, কক্ষ নং-৭৯৭৮।

৫. তাবীলুল আহাদীস :

এটি কুরআন মাজীদে বর্ণিত নবি-রাসুলদের ঘটনাবলির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বিষয়ে শাহ ওয়ালিউল্লাহর আরবি ভাষায় লিখিত একটি অনবদ্য গ্রন্থ। আম্বিয়ায়ে কেরামের ঘটনাপ্রবাহ ও মুজিযা-বৃত্তান্ত থেকে তিনি চমৎকার ও অসাধারণ

রহস্য উন্মোচন করেছেন। তিনি *ফাওজুল কবীর* গ্রন্থেও এই কিতাবটির কথা উল্লেখ করেন এবং এতে আলোচিত কোনো কোনো গুঢ়রহস্যকে অধিকতর বিশ্লেষণ করেন। নবি ও তাঁর গোষ্ঠীর লোকদের সামনে যে অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হয় তার একটি উৎপত্তি স্থল থাকে (শাহ ওয়ালিউল্লাহ ৪৬)। শাহ ওয়ালিউল্লাহ এই গ্রন্থের ভূমিকাতে নবি-রাসুলদের হাতে প্রকাশিত অলৌকিক ও বিস্ময়কর ঘটনার হেকমত, প্রকার, নীতি ও বোধগম্যতার বিষয়ে ধারণা দিয়েছেন। তিনি আদম (আ.), ইবলিস, নমরুদের আগুনের ঘটনা এবং মুসার (আ.) লাঠিকে স্বপ্ন দিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি লিখেছেন :

‘اعلموا أن الأحوال الطارية على نفوس الكمل والواقعات المنتظمة في المثال تكميلة لهم حكما حكمها المنام وكذلك الحوادث الواقعة كلها منامات.

“জেনে রেখ, বিশেষ কিছু অবস্থা যখন নুফুসে কামেলার (নবিগণ) কাছে উদ্ভাসিত হয় এবং তা রূপায়নের জন্য নমুনাজগতে অর্থাৎ পৃথিবীতে যা সংগঠিত হয় তা স্বপ্নের হুকুমের শামিল। অনুরূপভাবে সংঘটিত ঘটনাপ্রবাহ সবগুলো সম্পূর্ণ স্বপ্ন।” শাহ ওয়ালিউল্লাহ বলেছেন, এর মাধ্যমে কার্যকারণ ও অবলম্বনের বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণরূপে অকার্যকর হয় না। এই পর্দা একটি নির্দিষ্ট সীমার বাইরে ঠিকই কার্যকর থাকে। আম্বিয়ায়ে কেরামের মুজিযা সম্পর্কে তিনি যে দার্শনিক ব্যাখ্যা পেশ করেছেন তা পূর্বের তাফসিরকারকদের মতামত থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও ব্যতিক্রম (বশির আহমদ ৩১)। *তাবীলুল আহাদীস* গ্রন্থের কমপক্ষে দশটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। এর বাইরে সংস্করণ থাকার সম্ভাবনা আছে। এটি মূলত, আরবিতে লিখিত হলেও উর্দু এবং ইংরেজিতে গ্রন্থটির অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। উর্দুতে এর সর্বপ্রথম সংস্করণটি দিল্লির মাতবায়ে আহমদি থেকে ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে ছাপা হয়। এতে আরবি ও উর্দু দুইভাষার টেক্সট সংযোজন করা হয়। বইটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিলো আটাশি (কাসেমি ৯৬)।

উপসংহার :

উপরিউক্ত আলোচনায় শাহ ওয়ালিউল্লাহর কুরআন গবেষণাকেন্দ্রিক যেসব রচনাকর্মের ধারণা উপস্থাপিত হয়েছে এর মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, এ গ্রন্থগুলো সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মৌলিক রচনা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এছাড়াও তাঁর প্রতিটি গ্রন্থেই কুরআন বুঝার বিষয়টির কমবেশি আভাস আছে। যে কোনো বিষয়ের সমাধানে তিনি কুরআন থেকে দলিল ও প্রমাণ পেশ করে থাকেন। তাঁর উপস্থাপনার চমৎকারিত্বে যে কারও স্বাভাবিকভাবে মনে হবে যেন আয়াতটি এইমাত্র নাজিল হয়েছে ! এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ তাঁর *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ*। গ্রন্থটিতে তিনি ইসলামি শরীয়তের বিধানাবলির গুঢ়রহস্য উন্মোচন করেছেন। পাঠক একইভাবে তাঁর *ইযালাতুল খফা* গ্রন্থে খেলাফতের বিষয়ে কুরআনে হাকিমের আলোকচ্ছটা লক্ষ করবেন। ফিকহি বিষয়ে কুরআন থেকে দলিল পেশ করার উদাহরণ তাঁর *আল মুসাফফা ওয়াল মুসাওওয়া* গ্রন্থটিও। মোদ্দাকথা, শাহ ওয়ালিউল্লাহ তাঁর রচনাবলিতে কুরআন মাজীদকে নিজের চিন্তা-গবেষণার মানদণ্ড স্থির করেছেন। এই দৃষ্টিকোণে শাহ ওয়ালিউল্লাহর রচনাবলিকে কুরআন বোঝার বিষয়-শাস্ত্রে তথ্যভিত্তিক সেকেন্ডারি ও তত্ত্বীয় উৎস সাব্যস্ত করা যায়। যেমন সুরায়ে ফাতিহার আয়াত اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (সুরা ফাতিহা : ৬) এর সঙ্গে সুরা নিসার مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّـٰلِحِينَ (সুরা নিসা : ৬৯) -কে মর্মগত দিক থেকে সংযুক্ত করে পেশ করেছেন। এরপর প্রাসঙ্গিক হাদিস এনেছেন, যেখানে আল্লাহর রাসুল (সা.) হজরত আবু বকরকে (রা.) ‘সিদ্দিক’ ও হজরত ওমরকে (রা.) ‘শহীদ’ উপাধি প্রদান করেছেন। শেষে তিনি অনুসিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ‘সিরাতুল মুস্তাকিম’ তথা সত্য-সরল পথ হলো এই দুইজনের প্রদর্শিত পথ এবং তাঁরা প্রধান খলিফায়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (শাহ ওয়ালিউল্লাহ ৪৬)।

তথ্যসূত্র

আল-কুরআন

আজিজ, শাহ আবদুল, *মলফুজাতে শাহ আবদুল আজিজ*, মিরাট : মাতবায়ে মুজতাবায়ি, ১৩১১ হি.।

আজাদ, আবদুল খালেক, *কুরআনি তরজমা নেগারী কী আহাম্মিয়্যত আওর উসুল ওয়া কাওয়ানীন*, লাহোর : রহিমিয়া মতবুআত, ২০১৬।

কাসেমি, মুহাম্মদ সউদ আলম, *শাহ ওয়ালিউল্লাহ কী কুরআনী ফিকর কা মুতালায়া*, লাহোর : আল মাহমুদ একাডেমি, ১৯৯৮।

দেহলভি, শাহ ওয়ালিউল্লাহ, *আনফাসুল আরেফীন*, লাহোর : *মাতবায়ে আহমদি*, ১৮৯৭

দেহলভি, শাহ ওয়ালিউল্লাহ, *মুকাদ্দামায়ে ফাতহুর রহমান*, দিল্লি : মাতবায়ে আনসারি, ১৩০৩ হি.।

দেহলভি, শাহ ওয়ালিউল্লাহ, *ফাতহুর রহমান*, রিয়াদ : মালিক ফাহাদ প্রিন্টার্স, তা.বি.।

দেহলভি, শাহ ওয়ালিউল্লাহ, *আল ফওজুল কবীর ফী উসূলিত্ তাফসীর*, দিল্লি : মাতবায়ে মুজতাবায়ি, ১৯৯২।

দেহলভি, শাহ ওয়ালিউল্লাহ, *তাবীলুল আহাদিস*, হায়দারাবাদ : শাহ ওয়ালিউল্লাহ একাডেমি, তা.বি.।

জালবানি, গোলাম হোসাইন, *শাহ ওয়ালিউল্লাহ কী তালীম*, লাহোর : দারুল কিতাব, ২০০২।

লাহোরী, আবদুল রশিদ, "কুতুবখানায়ে টুংককে বাআজ মলহুজাত", *মাসিক মা'আরিফ*, দিল্লি : আজমগড়, তা.বি.।

লুধিয়ানভি, বশির আহমদ, *শাহ ওয়ালিউল্লাহ আওর উনকা ফালসাফায়ে* উমরানিয়াত মাআশিয়াত, লাহোর : বায়তুল হিকমত, ১৯৪৫।

লুধিয়ানভি, বশির আহমদ, *শাহ ওয়ালিউল্লাহ আওর উনকা ফালসাফায়ে* উমরানিয়াত মাআশিয়াত, লাহোর : বায়তুল হিকমত, ১৯৪৫।

সিন্ধি, ওবাইদুল্লাহ, *শাহ ওয়ালিউল্লাহ আওর উনকী ফালাসাফা*, লাহোর : সিন্ধু সাগর একাডেমি, ২০০২।

সিওহারভি, হিফজুর রহমান, "শাহ ওয়ালিউল্লাহ আওর মুকাদ্দামা তারজমাতুল কুরআন", *মাসিক বোরহান*, দিল্লি : অক্টোবর, ১৯৪৫।

Rizwi, S.A *Shah Wali Ullah and his time*, Lahore: Sahail Academy, 2004.